প্রশ্নোত্তরে

মিলাদ ও কিয়ামের বাহাস

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

আল্লামা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল-কাদেরী

মীলাদ ও কিয়ামের বাহাস

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াল্ আকেবাতুলিল্ মোত্তাকীন ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা-রাসুলিহি মোহাম্মাদেও ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি আজ্মাঈন।

আম্মা বা'দু

ফা-আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতোয়ানির রাজীম্ বিছ্মিল্লাহির্ রাহ্মানির রাহিম। লাকাদ্ মান্নাল্লাহু আলাল্ মুমেনীনা ইয্ বা'ছা ফিহিম্ রাছুলা। (কোর্আন মজীদ)

অর্থ :—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদারগণকে এক মহা অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন।

বেরাদরান-ই-ইসলাম! জানিয়া রাখুন, রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ঈমানদারের ঈমান ও ঈমানের জান। ইহকালে দুঃখীর দরদী, পরকালে নিঃসহায়ের সহায়, কবর-হাশর, মিযান-পুলছেরাতের উদ্ধারকারী মহাকাণ্ডারী প্রাণাধিক প্রিয়তম নয়নের মনি মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম।

প্রিয় পাঠক ! দরূদ শরীফ পাঠ করুন ঃ—

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছাল্লামু আলাইকা
ইয়া রাসুলাল্লাহ্
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছাল্লাম আলাইকা
ইয়া হাবীবাল্লাহ্
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছাল্লামু আলাইকা
ইয়া নাবীয়াল্লাহ্
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছাল্লামু আলাইকা
ইয়া নূরাল্লাহ্
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা
ইয়া শাফীয়াল মুজ্নেবীন্
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলা আলিহি
ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া বারীক ওয়াছাল্লাম্।

১নং প্রশ্ন ঃ— ওহাবী নজদী দেওবন্দী বলে মীলাদ শরীফের মাহ্ফিল বেদ্আত্ কারণ, তাহা রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জমানায় ছিল না ; এবং ছাহাবায়ে কেরামের জমানায় ও তাবেঈনগণের জমানায়ও ছিল না ; কাজেই উহা বেদ্আত্। আর, যেহেতু সকল প্রকার বেদ্আতই হারাম, এইহেতু মীলাদ মাহ্ফিল হারাম।

উত্তর :— মীলাদ শরীফকে বেদ্‌আত্‌ বলা মূর্খতার পরিচয়। কেননা, আছ্‌লে মীলাদ বা মীলাদ শরীফের উৎস (মূল) সুন্নত। এই সুন্নত ৭ (সাত) প্রকার। যথা :— (১) সুন্নতে ইলাহীয়া, (২) সুন্নতে আম্বিয়া, (৩) সুন্নতে মালাইকা, (৪) সুন্নতে মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম, (৫) সুন্নতে ছাহাবায়ে কেরাম, (৬) সুন্নতে ছুল্‌ফে ছালেহীন এবং (৭) সুন্নতে আম্মা তুল্‌ মোস্‌লেমীন।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মীলাদ মাহ্‌ফিল বেদ্‌আত্‌, তবে সকল্‌ প্রকার বেদআত্‌ই হারাম নয়। কোন কোন বেদআত আবার ওয়াজিবরূপেও গণ্য হয়। কোন কোন বেদআত্‌ মোস্তাহাব, কোন কোন বেদআত্‌ জায়েজ।

তফ্‌ছীরে রুহুল বয়ানে আছে—'মাহ্‌ফিলে মীলাদ 'বেদ্‌আতে হাসান' বা মোস্তাহাব।' এক্ষণে, বলি, হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পবিত্র জন্ম কাহিনী বর্ণনা, তাঁহার মহান শানের আলোচনা ও গুণ-গান এবং দরুদ ছালাম পাঠ কেমন করিয়া হারাম হইতে পারে? আল্লাহ্‌ হেদায়াত নসীব করুন!

২নং প্রশ্ন :—ওহাবীরা বলে মীলাদ মাহ্‌ফিলে বহু হারাম কার্য্য হয়; যথা—মেয়েলোক পুরুষ একত্র বসে, দাঁড়ীবিহীন যুবকের না'ত পাঠ এবং ভুল রেওয়ায়েত পাঠ ইত্যাদি। এই জন্যে এই মাহ্‌ফিল হারাম।

উত্তর :— ওহাবীদের এই দাবী মিথ্যা ও ধোকাবাজীপূর্ণ। ওহাবীরা মিথ্যা ও অপবাদ রটনা করিতে খুবই পটু। আল্লাহ্ এদের সুমতি দান করুন! আমি বলি—এই সমস্ত হারাম কার্য্য কখন এবং কোথায় হয়? যদি কোথাও এইরূপ হয় তবে, ইহার প্রমাণ আবশ্যক। যদি কোথাও এইরূপ ঘটিয়াও থাকে তবে, এই ঘটনাকে উল্লেখ করিয়া এই কথা বলিবার কি যুক্তি যে, মীলাদ মাহ্ফিলে এই এই হারাম কার্য্য হয়। জানিয়া রাখুন, এই সমস্ত হারাম কার্য্য সর্ব্বত্রই হয় না। যদি কোন স্থানে মীলাদ মাহ্ফিলে মেয়েলোক উপস্থিত হয়, তবে তাহারা পর্দার অন্তরালে থাকে, পুরুষ লোক পৃথক বসে এবং শরীয়তের পাবন্দী যথাযথভাবে রক্ষা করে। আর মীলাদ সম্বন্ধে সর্বদা বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত-ই পাঠ করা হয়। বরং মীলাদ পাঠকারী এবং শ্রোতামণ্ডলী অজুর সহিত বসে, দরুদ শরীফ আদব ও মুহব্বতের সহিত পাঠ করিতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, শ্রোতাগণ রাসুলে আকরাম নূরে মোজাচ্ছাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মহান শানের আলোচনা ও গুণ গানে মুগ্ধ ও বিভোর হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে চোখের পানিতে বুক ভাসাইয়া দেয়। আশেকের অন্তরে মাশুকের বিরহ বেদনার যে কী নিদারুণ জ্বালা তাহা একমাত্র আশেকই জানে, অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। আরে কমবখত ওহাবী! শরাব না খাইলে কিরূপে বুঝিতে পারিবে যে, শরাবে কি রকম নেশা রহিয়াছে?

যদি-ই মীলাদে বাজে-কথা হয়, কিংবা গাণ-বাদ্য হয় তাহা হইলে ঐ সমস্ত বাজে কথা কিংবা গান-বাদ্য হারাম হইবে, না প্রকৃত মীলাদ শরীফ, রাসুলে পাকের পবিত্র জন্ম-কাহিনী এবং তাঁহার মহান শানের আলোচনা ও গুণ-গান, দরূদ ও ছালাম হারাম হইবে? কোন হারাম কার্য্য হালাল কার্য্যের মধ্যে শামিল হইলেই হালাল কার্য্য হারাম হয় না। যদি তাহাই হইত তবে সর্বপ্রথম দ্বীনি মাদ্রাসাহ্ সমূহ হারাম হইয়া যাইত। কেননা, দাড়ী ছাটানো ও দাড়ী কামানো লোক এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে একত্রে বসে। কোন কোন সময় তাহাদের মধ্যে গোপনীয় এবং জঘন্য কাজও ঘটিয়া থাকে। অন্য কথায়, তিরমিজি শরীফ, বোখারী শরীফ এবং ইব্‌নে মাজাহ্ শরীফ প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত হাদীছের কিতাবে তফছীরের অনেক কিতাবেই সমস্ত রেওয়ায়াতই ছহীহ্ বা বিশুদ্ধ নহে; কতক রেওয়ায়াত জয়ীফ বরং মওজুও রহিয়াছে। তবে কি 'ঐ সমস্ত কিতাব ছহীহ্ বা বিশুদ্ধ নহে'—এ কথা বলা যাইবে? আজকাল, মাদ্রাসার কতিপয় ছাত্র এবং কতিপয় শিক্ষক এমনও পাওয়া যাইবে যাহারা দাড়ী ছাঁটানো বা দাড়ী সম্পূর্ণরূপে কামানো। তবে কি এই সমস্ত কারণে মাদ্রাসাহ্ বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে? না এই সমস্ত নাজায়েজ কাজ সমূহ দূরীকরণের চেষ্টা করা হইবে? বলুন তো, দাঁড়ী কামানো কোন ব্যক্তি যদি কোরআন শরীফ পাঠ করে, তাহা হইলে কোরআন শরীফ কি বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে?

কখনও নহে। দাঁড়ী কামানো লোক মীলাদের মাহ্‌ফিলে উপস্থিত হইলে কিংবা না'ত পাঠ বা মীলাদ পাঠ করিলে মীলাদ পাঠ বন্ধ হইবে কেন? আল্লাহ্‌ ওহাবীদের হেদায়াত নসীব করুন.!

৩নং প্রশ্ন ঃ— মাহ্‌ফিলে মীলাদের কারণে মানুষ দীর্ঘ রাত্রির পর নিদ্রায় যায় এবং ইহার ফলে ফজরের নামাজ কাজা হইয়া যায়; যাহার দ্বারা ফরজ ছুটিয়া যায় তাহাই হারাম। কাজেই মীলাদ মাহ্‌ফিল হারাম।

উত্তর ঃ—প্রথমতঃ মীলাদ সর্বদাই রাত্রিকালে হয় না। অনেক সময় দিনের বেলাতেও অনুষ্ঠিত হয়। আবার রাত্রিতে হইলেও উর্দ্ধে ১০/১১টা পর্যন্ত মাহ্‌ফিল চালু থাকে। প্রায় অধিক মানুষই স্বাভাবিকরূপে রাত্রি ১০/১১টা পর্যন্ত জাগ্রতই থাকে। মীলাদ মাহ্‌ফিলের কারণে যদি কখনও অধিক রাত্র কাটিয়াও যায় তবে যাহারা নামাজের জমাতের পাবন্দ লোক তাহারা ভোরে অবশ্যই জাগিয়া উঠে নিদ্রা ভংগ হয়। ইহা পরীক্ষিত। ওহাবীদের এই প্রশ্ন শুধুমাত্র জিক্‌রে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে বন্ধ করার জন্যে ইহা একটা নিছক বাহানা মাত্র। যদি ইহা কোন সময় মীলাদ মাহ্‌ফিলের কারণে সারা রাত্রি কাটিয়া যায়, যার কারণে ভোরে ফজরের নামাজ কাজা হইয় যায় তবে ইহাতে মীলাদ শরীফ হারাম হইবে কেন? প্রতি বৎসর মাদ্রাসার বার্ষিক

সভার জন্যে কিংবা অন্যান্য ধর্মীয় কাজে রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়, অনেক সময় বিবাহ-মজলিশে রাত্রি শেষ হইয়া যায়; রাত্রিকালে গাড়ীতে ছফর করিতে হয় সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, মাদ্রাসার বার্ষিক সভা, বিবাহ-মজলিশ এবং রেলগাড়ীর ভ্রমণ হারাম, না হালাল? যখন এই সমস্ত হালাল থাকে তবে মীলাদ শরীফ হারাম হইবে কেন? তাহা না হইলে হারামের কারণ বল।

৪নং **প্রশ্ন** ঃ—আল্লামা শামী তাহার শামী কিতাবের ২য় খণ্ডে কিতাবুচ্‌ছৌম্ বাব্‌ নজরে আম্‌ওয়াতের মধ্যে লিখিয়াছেন যে মীলাদ শরীফ সব চাইতে খারাপ কাজ। তফ্‌ছীরাতে আহ্‌মদীয়াতে লিখিত আছে—মীলাদ শরীফ হারাম, যে হালাল জানে সে ব্যক্তি কাফের—ইহাতে বুঝা যায় যে, মীলাদ শরীফ নেহায়েত খারাপ কাজ।

উত্তর ঃ—আল্লামা শামী রাঃ) মাহ্‌ফিলে মীলাদ শরীফকে হারাম বলেন নাই। বরং যে মাহ্‌ফিলে গান বাদ্য এবং ফুজুল কার্য্য হয় অথচ ঐ মাহ্‌ফিলকে লোকে মীলাদ মাহফিল বলে, ছোয়াবের কার্য্য বলিয়া ধারণা করে, উহাকে নিষেধ করিয়াছেন, কিংবা হারাম বলিয়াছেন। কাজেই, শামী কিতাবের ঐ অধ্যায়ে এই কারণে লিখিত আছে যে মীলাদের আয়োজন করা জায়েজ নয়। কেননা, মীলাদে গান-বাদ্য ও ফুজুল কর্ম করা হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, গান-বাদ্যকে এবং ফুজুল কর্মকে এক সময় লোকে মীলাদ বলিত।

তদ্রূপ তফছীরাতে আহমদীয়া শরীফে ঐ সমস্ত ফুজুল কর্মের বর্ণনাও করিয়া দিয়াছেন। (তফছীরাতে আহমদীয়া) ছুরায়ে লোকমানের 'অমিন্নান্নাছে মাইঁয়্যাস্‌তারি লাহ্‌ওয়াল হাদীস' এই আয়াতের মর্মে লিখিত আছে—আমি বলিতেছি যে, মাহফিলে মীলাদে যেন কোন প্রকার কুরীতি বা কু-প্রথা না হয়। যেমন, করাচীতে দেখা যায় যে, কোন কোন স্থানে বাদ্য-যন্ত্র সহকারে নাতে রাসুল পাঠ হয়, এবং লোকে ইহাকে মীলাদ শরীফ বলে; কোন স্থানে এক ব্যক্তি তাহার পিতার নামে খতম পড়াইবার নিয়তে কোরআন শরীফ পাঠের স্থলে গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজাইয়া ইহার ছোয়াব তাহার পিতার নামে বখ্‌শিয়া দেয়।' এই সমস্ত বেহুদা কার্য্যাবলীকে কে জায়েজ বলে? সুতরাং, আল্লামা শামী এবং তফছীরাতে আহমদীয়ার জমানায় ঐ ধরণের নাজায়েজ কার্য্য হইত, তাই তাহারা নিষেধ করিয়াছেন। তাহা না হইলে নাজায়েজও হারাম বলিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

নফ্‌ছে মীলাদ শরীফ বড়ই [illegible] ও ছোয়াবের কাজ; ইহার ফাজায়েল ও বারাকাত অফুরন্ত। ইহার বদলৎতে রহমতে আলম নূরে মোজাচ্ছম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মুহব্বত, কোরবত, তাওয়াজ্জুহ, এবং জিয়ারত লাভ হয়। নফছে মীলাদ শরীফকে নাজায়েজ বলা কুফুরী, যে ব্যক্তি নাজায়েজ বলিবে সে কাফের। প্রায় ৮ শতাব্দী যাবত মীলাদ মাহফিল প্রচলিত আছে। উলামা,-ফোকাহা,

মোহাদ্দেছ সকলেরই সর্ব্বাদী সম্মত রায় ইহার সপক্ষে রহিয়াছে ; বরং মাহফিলে মীলাদ ইমামগণের 'ইজমার' দ্বারা সমর্থিত। এমন কি ওহাবীদের নেতা মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও মৌঃ আশরাফ আলী থানভীর পীর ও মুরশীদ হাজী এমদাদ্ উল্লাহ মোহাজেরে মক্কী সাহেব বড় আগ্রহের সহিত মীলাদ মাহফিল করিয়াছেন।

৫নং প্রশ্ন :—না'ত খানী হারাম, কেননা ইহা এক প্রকার সঙ্গীত ; এবং সঙ্গীতের প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফে নিষেধাজ্ঞা আসিয়াছে।

উত্তর :— না'ত বলা এবং পাঠ করা উত্তম এবাদত। এক অর্থে সমগ্র কোরআন মজীদ হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের এক অনুপম না'ত শরীফ। অতীত যুগের নবীগণ হুজুরে পাকের না'ত (প্রশংসা-স্তুতি) করিয়াছেন এবং সমস্ত মুসলমানগণই না'ত শরীফকে মোস্তাহাব জানিয়াছেন। স্বয়ং হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম স্বীয় না'ত শরীফ শ্রবণ করিয়াছেন এবং না'তখান অর্থাৎ প্রশংসাকারীকে দোয়া করিয়াছেন। হজরত হাচ্ছান রাদিয়াল্লাহু আন্হু হুজুরে পাকের দরবারে এইরূপ একজন না'তখান (না'তিয়া গায়ক) ছিলেন। তিনি হুজুর পাকের দরবারে নাতিয়া ও আশ্‌য়ার এবং কাফেয়ের মুজাম্মাত্ (অর্থাৎ মালামত) পদ্যের আকারে পেশ করিতেন। ইহাতে হুজুরে পাক তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া মসজিদে

তাহার জন্য একটি মিম্বর স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। হজরত হাচ্ছান (রাঃ) উহাতে দণ্ডায়মান হইয়া ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শানে আজমতের অনুপম নাতিয়া শুনাইতেন। আর হুজুরে পাক তাহার জন্য এই দোয়া করিতেন "আল্লাহুম্মা আইয়েদহু বিরুহিল্ কুদ্দুস।" অর্থাৎ, 'আয় আল্লাহ। হাচ্ছানকে তাহার আত্মার পবিত্রতার সহিত সাহায্য কর।' (মেশকাত শরীফ ২য় খণ্ড, বাবুশ্‌শের দ্রষ্টব্য)।

উপরিউক্ত হাদীছের দ্বারা জানা গেল যে, না'তখানী এমন একটি উৎকৃষ্ট এবাদত যে, ইহার কারণে হাচ্ছান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হুজুর ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দরবারে মিম্বার দেওয়া হইয়াছে। হজরত আবু তালেব হুজুরে পাকের শানে বহু না'ত লিখিয়াছেন। ইমাম খরফুতি (রাঃ) শরুহে কাছিদায়ে বুরদায় লিখেন—কাছিদায়ে বুরিদা শরীফের লেখক ইমাম আল্লামা বুসীরী (রাঃ) অর্দ্ধাংগ বিমারে পড়িয়াছিলেন। বহু চিকিৎসার পরও যখন কোন প্রতিকার হইল না তখন মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার এশ্‌কের সমুদ্রে ডুব দিলেন; এবং অবশেষে, 'কাছিদায়ে বুরিদা' রচনা করিলেন। ইহার পর এক রাত্রিতে স্বপ্নযোগে হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দরবারে দাঁড়াইয়া ইমাম বুসীরী উক্ত কাছিদায়ে বুরিদা শরীফের নাতিয়া হুজুরে পাককে পাঠ করিয়া

শুনাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় (সুস্থ) হইয়া গেলেন; যেন তাহার কোন রোগই ছিল না। অতঃপর হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের তরফ হইতে একখানি নূরানী চাদর উপহার পাইলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, না'তশরীফের বদওলতে দীন ও দুনিয়ার সব নিয়ামত লাভ হয়।

মাওলানা জামী ইমাম আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং হুজুর গাওছে পাক ও আলা হজরত ফাজেলে বেরিলুভী আলাইহিমার রাহমাত, হুজুর ছরকারে কায়েনাতের শানে গভীর তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ কাছিদা ও নাতিয়া রচনা করিয়াছেন। ফল কথা, সমস্ত আওলিয়ায়ে কেরাম ও হাক্কানী উলামায়ে এজাম ছরকারে দোজাহান হাবীবুর রাহমান ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শানে না'ত লিখিয়াছেন, পাঠ করিয়াছেন এবং তাহাদের না'ত শরীফ আশেকানে মোস্তফার নিকট বড়ই মশহুর হইয়া আছে। কুতুবে হাদীছ ও ফেকার মধ্যে গান-বাদ্য ইত্যাদি নাজায়েজ ও খারাপ কার্য্য বলিয়া উল্লেখ আছে; কিন্তু নাতিয়াকে কেহ খারাপ বলেন নাই। বরং ফোকাহাগণ বলেন যে, ফছি ও বলিগ আশ্আর শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া, যদিও উহার বিষয়বস্তু খারাপ হয়, কিন্তু উহার শব্দসমূহ দ্বারা এল্মের উন্নতি লাভ হয়।

মীলাদ মাহ্ফিলে মিষ্টান্ন বিতরণ করা উত্তম কাজ। খুশীর বিষয়ে খাবার খাওয়ানো মিষ্টি দ্রব্য বিতরণ করা বড়ই

উত্তম এবং ছোয়াবের কাজ। হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে—আকীকা, ওলিমা ইত্যাদিতে খানার দাওয়াত ছুন্নত, কেননা, উহা খুশীর কাজ; বিশেষ করিয়া বিবাহের সময় খোরমা বিতরণ বরং লুট করা ছুন্নত। অনুরূপভাবে, আনন্দ প্রকাশের জন্যেই মুসলমানগণ রাসুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মীলাদ মাহ্‌ফিল করিয়া থাকে। এবং মীলাদ অনুষ্ঠানের দাওয়াত করিয়া থাকে। ছদকা-খায়রাত করে এবং মিষ্টি দ্রব্যাদি বিতরণ করে। তদ্রূপ, পূর্বেকার যুগের মরুব্বীগণ অথবা এখনও ছুন্নী মুছলমানেরা কোরআন শরীফের ছবক নিবার সময় এবং খতম শেষ হইলে মিষ্টি বিতরণ করিয়া থাকে; উহা ছুন্নতে ছলফে ছালেহীন। এবং মাহফিলে মীলাদ ধর্মীয় উত্তম কাজ। এই জন্যে মুছলমান প্রথমতঃ নিজ বংশের লোকদিগকে, আত্মীয়-স্বজনকে অতঃপর ভিন্ন পরিবারের প্রতিবেশীদিগকে দাওয়াত করিয়া থাকে; অবশেষে, মাহফিলের লোকদিগকে মিষ্টি দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়া দেয়। ইহার আসল বা মূল কোরআন হাদীছে অবশ্যই পাওয়া যায়—আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ :—

ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু ইজা নাজাইতুমুর্ রাসুলা ফাকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাই নাজ্‌ওয়াকুম্ ছাদাকাতান্ জালিকা খায়রুল্লাকুম্ ওয়া আত্‌হারু।" —(২৮ পারা, ছুরা-মুজাদেলাহ্)

অর্থ :- হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমরা রাসুলুল্লাহ, (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের) নিকট কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাও তখন প্রথমেই কিছু ছদকা কর।

এই আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, ইব্‌তেদায়ে ইসলামের সময় মুসলমানের উপর ওয়াজিব ছিল যে, যখন রাসুলে পাকের নিকট কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিত তখন দান-খয়রাত করিত। কাজেই, হজরত আলী (রাঃ) এক দিনার দান করিয়া হুজুরে পাকের নিকট হইতে ১০টি মসআলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অবশ্য এই আদেশ মনছুখ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, এই আয়াতের প্রত্যক্ষ হুকুম স্থগিত হইয়া গিয়াছে। তফ্‌ছীরে খাজায়েনুল্ এরফান, খাজেন এবং মাদারেক দ্রষ্টব্য যদিও আয়াত মনছুখ হওয়ায় ওয়াজেবের হুকুম স্থগিত হইয়াছে তবু কিন্তু আসল এবাহাত ও মোস্তাহাব বাকী রহিয়াছে। ইহাতে জানা গেল যে, আওলিয়াগণের মাজার শরীফে সিরনী নিয়া, পীর-মুরশীদ উস্তাদ ও আলেমগণের দরবারে কোন কিছু নিয়া হাজির হওয়া মোস্তাহাব। তদ্রূপ, কোরআন শরীফ-হাদীস শরীফ কিংবা ধর্মীয় কোন কিতাবাদির সবক বা পাঠারম্ভ কালে কিছু খায়রাত করিয়া লওয়া উত্তম ও ছোয়াবের কার্য্য। মীলাদ শরীফ পাঠ করা প্রকৃত পক্ষে হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সঙ্গে কালাম করা হয়। বায়হাকী শরীফে শোবুল ঈমানের মধ্যে আছে যে, হজরত ইব্‌নে উমর (রাঃ) রেওয়ায়াত করিয়াছেন যে, হজরত

ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আন্হু ছুরায়ে বাকারা ১২ (বার) বৎসরে নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। যখন পাঠ শেষ হইল অর্থাৎ খতমের দিন ১টি উট জবাহ্ করিয়া বিরাট খানা বা ভোজের আয়োজন করতঃ ছাহাবায়ে কেরামগণকে দাওয়াত পূর্ব্বক আনন্দ ভোজন করিয়াছিলেন। এক্ষণে, কোন উত্তম কাজকে সমাপ্ত করিয়া মিষ্টি বিতরণ করা এবং খানা প্রস্তুত করিয়া খাওয়ানো প্রমাণ হইয়া গেল। অনুরূপভাবে, মীলাদ শরীফও একটি উত্তম ও ছোয়াবের কাজ

বুজুর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন যে, 'যদি কোন আত্মীয়-স্বজনের নিকট যাইতে হয় তখন খালি হাতে যাইতে নাই; কোন কিছু লইয়া যাইতে হয়।

[তাহাদো ওয়া তুহিব্বু] "একে অন্যকে হাদীয়া দাও, ইহাতে মহব্বত বৃদ্ধি পাইবে।" ফোকাহাগণ বলিয়াছেন— যখন দিয়ারে মাহবুব, অর্থাৎ মদীনা শরীফে যাও, তখন মদিনার ফকীরদিগকে ছদকা করিও, কেননা তাহারা রাসুলে পাকের পড়শী (প্রতিবেশী) আল্লাহ্ পাকের দরবারেও প্রথম এই প্রশ্ন হইবে যে, 'কি আমল নিয়া আসিয়াছ?' মীলাদ শরীফে তাবারুক বিতরণ কর অপব্যয় নহে।

কেহ ছাইয়্যেদেনা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলিয়াছিলেন—

[লা-খায়রা ফিচ্ছারফে] অর্থাৎ, অপব্যয়ের মধ্যে কোন মঙ্গল নাই। তৎক্ষণ, ইহার উত্তরে হজরত উমর ফারুক (রাঃ) বলিলেন—

[লা-ছারাফা ফিল খায়রে] অর্থাৎ উত্তম কার্য্যে খরচ করা অপব্যয় নহে।

৬নং প্রশ্ন :— মাহফিলে মীলাদের জন্য লোকদিগকে ডাকা হারাম। লোকদিগকে ডাকিয়া নফল নামাজের জমাত করা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে ; তবে কি মীলাদ শরীফ ইহার চাইতেও বড় কাজ ?

উত্তর :—ওয়াজের মাহফিল, ওলিমার দাওয়াত, পরীক্ষা এবং বিবাহ-শাদী ও নাকীক ইত্যাদিতে লোকজনকে আহ্বান করা হইয়া থাকে। বলুন তো, এই ডাকা হারাম হইয়াছে না হালাল রহিয়াছে ? যদি বলেন যে ; বিবাহ-শাদী, ওয়াজ-নসিহত ইসলামের ফায়ায়েজের অন্তর্ভূক্ত ; কাজেই, এই সমস্ত কাজের জন্যে লোকজনকে ডাকিয়া জমায়েত করা হালাল। এক্ষণে বলি, যদি তাহাই হয়, তবে 'তাজীমে রাসুল যাহা ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরজ, বরং ঈমানের প্রধান অংগ যাহা ব্যতীত কোন ফরজই আল্লাহুর দরবারে কবুল হয় না। ইহার তামিলকরণার্থেই তো মীলাদ শরীফ ও কিয়াম ই-তাজিমীর আয়োজন করা হয়। এবং মীলাদের জন্য লোকজনকে ডাকিয়া একত্র জমা করা হালাল। নামাজের উপর অন্য কোন বিষয়কে কিয়াছ করা নিরেট জাহেলের

কাজ। যদি কেহ বলে যে, নামাজ বিনা অজুতে নিষেধ। তাই, কোরআন তেলাওয়াত ও বিনা অজুতে না হওয়া চাই, সে ব্যক্তি আহম্মক। ইহাই কিয়াছ মা'য়াল ফারেক।

৭নং প্রশ্ন :—কাহারও স্মরণার্থে মাহফিল করা এবং দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করা শেরেক; এবং মীলাদ শরীফে উভয়টিই রহিয়াছে। কাজেই, মীলাদ শরীফের মাহফিলও শেরেক।

উত্তর :—খুশীর দিনকে স্মরণার্থে মাহফিল করা সুন্নত, এবং দিন-তারিখ নির্দ্দিষ্ট করাও সুন্নত। ইহাকে শেরেক বলা চরম মূর্খতা ও বেঈমানি। আল্লাহ্ তায়ালা হজরত মুছা আলাইহিচ্ছালামকে আদেশ দিয়াছেন যে, 'ওয়াজাকিরহুম বিআইয়্যামিল্লাহ্' অর্থাৎ, বনি ইছরাঈলকে ঐদিন স্মরণ করাইয়া দাও; যেই দিন আল্লাহ্ তায়ালা বনি ইছরাঈলের উপর নিয়ামত নাযিল করিয়াছেন। যেমন ফেরাউন ডুবিয়া মরা, মনওয়া-ছালওয়া নাযিল হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। (তফছীরে খাজায়েনুল এরফান)।

প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহ্ তায়ালা যে যে দিন সমূহে আপন বান্দাহ্গণের উপর নিয়ামত দান করিয়াছেন ঐ দিন-গুলিকে স্মরণ করিবার আদেশ রহিয়াছে। মেশকাত শরীফের হাদীছে আছে যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নিকট কেহ সোমবার দিন রোজা রাখিবার প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছেন যে, আমি ঐ দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং ঐ দিন হইতে ওহি নাজিল হওয়া আরম্ভ

হইয়াছে। এক্ষণে প্রতীয়মান হইল যে, সোমবারে রোজা রাখা এই জন্যেই সুন্নত যে, "ঐ দিন হুজুরে পাকের জন্ম দিবস।" ইহাতে তিনটি বিষয় অতিশয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইল :—(১) খুশীর দিনকে স্মরণার্থে মাহ্‌ফিল করা সুন্নত ; (২) ইহার জন্য দিন নির্দ্দিষ্ট করা সুন্নত ; (৩) হুজুরে পাকের পয়দায়েশের খুশীতে এবাদত করা সুন্নত। এবাদত বদনী হউক যেমন—রোজা এবং নফল নামাজ ; এবং এবাদত মালী হউক ; যেমন—ছদকা-খায়রাত, মিষ্টি বিতরণ ইত্যাদি। ঐ হাদীছ মেশকাতে আছে যে, যখন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মদীনা শরীফে গেলেন তখন মদীনার ইহুদীদিগকে দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা আশুরার রোজা রাখে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা উত্তর দিল যে, ঐ হজরত মুছা আলাইহিচ্ছালামকে আল্লাহ পাক ফেরাউনের হাত হইতে নাযাত দিয়াছিলেন ; আমরা ইহার শোকরিয়া আদায় করণার্থে ঐ তারিখে রোজা রাখিয়া থাকি। তখন হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিলেন—ফানাহ্‌নু আহাক্কু ওয়া আওলা বিমুছা মিনকুম অর্থাৎ, বস্তুতঃ তাহাই। হাদীছে উল্লিখিত আছে—'ফাছামাহু ওয়া আমারা বিছিয়াহি' অর্থাৎ, হুজুরে পাক স্বয়ং-ও ঐ দিন রোজা রাখিয়াছিলেন এবং লোকদিগকে আশুরার রোজা রাখিবার আদেশ করিয়াছিলেন। কাজেই, ইসলামের প্রাথমিক সময়ে এই রোজা ফরজ ছিল ; এখন ফরজিয়ত মনছুখ হইয়া গিয়াছে

কিন্তু মোস্তাহাব বাকী রহিয়াছে। মেশকাত শরীফে ঐ জায়গায় আছে যে, আশুরার রোজা রাখার বিষয়ে কোন ব্যক্তি আরজ করিলেন যে, ইহাতে নাকি ইহুদীদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়। ইহার উত্তরে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিলেন—"আচ্ছা, আগামী বৎসর যদি বাঁচিয়া থাকি তবে দুইটি রোজা রাখিব। অর্থাৎ ছাড়িলেন না ; বরং ১টি রোজা অতিরিক্ত করিয়া ইহুদীদের সঙ্গে সম্বন্ধ হইতে বাঁচাইলেন. এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি—পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের রাকাত ভিন্ন ভিন্ন কেন? যথা—ফজরে ২ রাকাত, মাগরিবে ৩ রাকাত, আছর ও জহুরে ৪ রাকাত। ইহার উত্তর এই যে, এই নামাজগুলি অতীত আম্বিয়াগণের স্মরণার্থে। যথা :—হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম দুনিয়ায় অবতরণ করিয়া যখন রাত্রি দেখিলেন তখন তিনি পেরেশান হইলেন, অতঃপর যখন ভোর হইল তখন আলোক দেখিয়া হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম শোকরিয়া আদায় করণার্থে ফজরের দুই রাকাত নামাজ আদায় করিলেন। হজরত ইবরাহীম আলাইহিচ্ছালাম তাঁহার ছেলে হজরত ইছমাঈল আলাইহিচ্ছালামের ফেদইয়া স্বরূপ দুম্বা পাইলেন, ছেলের জান বাঁচিল, এর কোরবাণী কবুল হইল। তখন হজরত ইবরাহীম আলাইহিচ্ছালাম খোদা তালার শোকরিয়া স্বরূপ ৪ রাকাত নামাজ পড়িলেন। ইহাই ছিল জহুরের নামাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। জানা গেল যে নামাজের রাকাতসমূহও পূর্বেকার জমানার নবীগণের স্মরণার্থে।

হজ্ব-ওতো, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিবি হাজেরা ও ইছমাঈল এবং ইবরাহীম আলাইহিচ্ছালামের স্মৃতি স্মরণার্থে। এখন ঐ স্থানে পানির তালাসও নাই, কিংবা শয়তানও কোরবাণীতে বাধা দেয় না; কিন্তু ছাফা-মারওয়ার দৌড়া-দৌড়ী, মিনাতে শয়তানকে কংকর মারা সবই হুবহু বাকী রহিয়াছে। আর তাহা একমাত্র অতীত স্মৃতিকে স্মরণার্থেই। অপরদিকে, রমজান মাস বিশেষভাবে শবে কদর এই জন্যই অতি ফজিলতের রাত্রি যে, ঐ কদরের রাত্রিতে কোরআন নাযিল হইয়াছিল। যথা—আল্লাহ পাক বলেন—

"শাহ্রু রামাযানাল্লাজি উন্যিলা ফিহিল কোরআন" আরও বলেন—"ইন্না আন্যালনাহু ফি লাইলাতিল কাদরে'

যখন কোরআন নাযিল হইবার কারণে রমযান মাস এবং কদরের রাত্রি কিয়ামত পর্যন্ত উত্তম হইয়া গেল, সেই ক্ষেত্রে ছাহেবে কোরআন যিনি সেই মহা নবী আল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামার পবিত্র বেলাদত অর্থাৎ মীলাদ শরীফ এবং ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ যে কিয়ামত পর্যন্ত অতি উত্তম ও সম্মানিত এবং মহা বরকত ও ফজিলতময়রূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পুনরায় উল্লেখ্য যে, হযরত ইছমাঈল আলাইহিচ্ছালামের কোরবানীর দিনকে ঈদের দিন বা খুশীর দিন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। ইহাতেও প্রতীয়মান হয় যে, যে দিন যে তারিখে আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তির

উপর আল্লাহর রহমত আসিয়াছে ঐ দিন ঐ তারিখ কিয়ামত পর্যন্ত রহমত ও বরকতের দিন বলিয়া পরিগণিত। দেখুন, শুক্রবার এইজন্যই ফজিলতের দিন যে, ঐ দিন অতীত যুগের নবীগণের উপর আল্লাহর নিয়ামত সমূহ নাযিল হইয়াছিল। আদম আলাইহিচ্ছালামের জন্ম ঐ শুক্রবারে; আদম আলাইহিচ্ছালামকে ঐ শুক্রবারেই ফেরেশতাগণ সেজদা করিয়াছিলেন। ঐ শুক্রবারেই আদম আলাইহিচ্ছালাম দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন। ঐ শুক্রবারেই নূহ আলাইহিচ্ছালামের নৌকা কিনারে লাগিয়াছিল; ঐ শুক্রবারে ইউনুছ আলাইহিচ্ছালাম মাছের পেট হইতে বাহির হইয়াছিলেন। ঐ শুক্রবারেই ইয়াকুব আলাইহিচ্ছালাম তাঁহার প্রিয়তম পুত্র ইউছুফ আলাইহিচ্ছালামের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ঐ শুক্রবারে মুছা আলাইহিচ্ছালাম ফেরআউনের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। ঐ শুক্রবারেই কিয়ামত হইবে। মোট কথা, এই সমস্ত কারণে শুক্রবার অন্যান্য বার সমূহের সর্দ্দার হইয়াছে। উত্তম দিনরূপে পরিগণিত হইয়াছে। তদ্রূপ, ইহার বিপরীত অবস্থা, যে সমস্ত জায়গায় ও তারিখে আজাব নাযিল হইয়াছে ঐ জায়গা ও তারিখসমূহকে ভয় করিতে হয়। যথা—মঙ্গলবারে কোন উত্তম কাজ না করাই ভাল, তাহা এই জন্যে যে, খুনের তারিখ। মঙ্গলবারে হাবিল কাতল হইয়াছিল। ঐ মঙ্গলবারেই হজরত হাওয়া আলাইহিচ্ছালামের হায়েজ আরম্ভ হইয়াছিল। দেখুন, ঐ

সমস্ত ঘটনা যে দিন এবং যে তারিখসমূহে হইয়াছিল তাহা একবারই ঘটিয়াছিল। কিন্তু তবু, ঐ সমস্ত ঘটনার কারণেই দিনসমূহের শ্রেষ্ঠতা ও নীচতা চিরদিনের জন্য নির্ধারিত হইয়া গেল। ইহাতে জানা গেল যে, বুজুর্গানে দ্বীনের খুশী অথবা স্মৃতি পালন করা এবাদতের মধ্যে গণ্য। পক্ষান্তরে, কোন নেক কাজ দিন-তারিখ ধার্য্য করিয়া পালন করিলেই যদি শেরেক হয় তবে, দেওবন্দ মাদ্রাসার পরীক্ষার তারিখ, বার্ষিক সভার ও দস্তরবন্দের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করায় দেওবন্দীরা সবার আগেই মুশ্‌রেক হইবে। তাহা ছাড়া, মাদ্রাসাহ্‌ বন্ধের জন্যে রমজান মাসকে নির্দ্দিষ্ট করা, শিক্ষকগণের বেতনের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করা, জমাতের জন্যে ঘন্টা-মিনিট নির্দ্দিষ্ট করা, খাইবার ও শুইবার সময় নির্দ্দিষ্ট করা ; এবং বিবাহ-ওলিমা কিংবা আকীকার তারিখ নির্দ্দিষ্ট করা কি শেরেক হইবে না ? হে দেওবন্দী ওহাবী ! সাবধান হও ! মীলাদ শরীফকে শেরেক করিবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়া নিজের ঘরে আগুণ দিও না। এই সমস্ত তারিখ কেবল নেক আমলের অভ্যাস গঠনের জন্যেই নির্ধারিত হইয়া থাকে। এই রকম ধারণা কেহ করে না যে, ঐ তারিখে মীলাদ শরীফ, ওরুছ ও ইছালে ছাওয়াবের মাহ্‌ফিল করা জায়েজ নাই। এই জন্যেই যুক্ত-প্রদেশে সকল প্রকার মছিবতের সময় কিংবা কাহারও মৃত্যুর পর মীলাদ শরীফ পাঠ করা হয়। কাটিহারে বিবাহের দিন মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করা হয়।

মৃত্যুর পর ৩য় দিবসে, ১০ তারিখে এবং ৪০ তারিখে মীলাদ শরীফ করিয়া থাকে। আবার, রবিয়ল আউওয়াল মাসে সর্ব্বত্রই সারাটা মাসব্যাপী মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। একমাত্র দেওবন্দ ব্যতীত। বাংলাদেশের সব জায়গায় এমনকি ঘরে ঘরে পর্যন্ত অতি ধুম-ধামের সহিত মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কেবল দেওবন্দী ওহাবী ব্যতীত। বরং এই কথাও শোনা যায় যে, দেওবন্দের অধিবাসীরাও মীলাদ শরীফের আয়োজন করিয়া থাকে। উল্লেখ্য যে, কয়েক বিষয়ে দিন-তারিখ নির্দ্দিষ্ট করা নিষেধ। হিন্দুদের মত হুলি, দেওয়ালীর জন্য দিন-তারিখ ধার্য্য করা; কিংবা উহার তাজিমের জন্য খানা তৈয়ার করা; মন্দিরে যাইয়া দান-খয়রাত করা হারাম। এক্ষণে, এই সমস্ত প্রশ্নের দ্বারা জানা গেল যে, খারেজী দেওবন্দী ওহাবীদের নিকট মীলাদ শরীফকে হারাম প্রমাণ করিবার কোন দলীলই নাই। লোকে ইহাদিগকে ওহাবী বলে। ওহাবীদের আলামত সমূহের মধ্যে কতক ইহাও যে, মীলাদ না পড়া, কিয়াম না করা, আজানের বাদ হাত উঠাইয়া মুনাজাত না করা, নামাজে দোয়াল্লীনের পরিবর্তে জোয়াল্লীন্ পড়া ইত্যাদি। এই সমস্ত কারণে এরা ওহাবী বেঈমান বলিয়া আখ্যায়িত হইবার ফলে হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পবিত্র মীলাদ শরীফকে হারাম প্রমাণ করিবার অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠে। কিন্তু কোন দলীল পেশ

করিতে পারে না কেবল নিজেদের কাল্পনীক ও মনগড়া প্রলাপোক্তি ছাড়া। যথা—ভারতীয় ওহাবীদের নেতা মৌঃ রশীদ আহাম্মদ গাঙ্গুহী লিখিয়াছে—"মীলাদ হিন্দুদের সংকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর তুল্য।" খুব স্মরণ রাখিবেন এই প্রসঙ্গেই আলাহজরত মোজাদ্দেদে মিল্লাত (রাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—

মিট্‌গায়ে মিট্‌তেহে মিট্ যায়েঙ্গে প্রাদা তেরা না মিটাহে না মিটেগা চর্চ্চা তেরা।

———

প্রশ্নোত্তরে মীলাদ শরীফের কিয়াম ঃ---

১। **প্রশ্ন ঃ**—মীলাদের কিয়াম প্রথম তিন যুগে ছিল না ; অর্থাৎ রাসুলে পাকের যুগে, ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এবং তাবেঈনগণের যুগে ছিল না ; কাজেই উহা বেতআত, এবং সকল প্রকার বেদআতই হারাম। হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ঐ তাজিম করা উচিত যাহা সুন্নতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, নিজেদের মনগড়া রীতি যেন উহাতে সামিল না হয়। ছাহাবায়ে কেরাম যাহা করেন নাই তাহা আমরা করিব কেন ? তবে কি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রতি আমাদের ভালবাসা ছাহাবায়ে কেরামের চাইতেও বেশী ?

উত্তর ঃ—বেদআতের উত্তর তো ইতিপূর্বে বহুবার দেওয়া হইয়াছে সকল প্রকার বেদআতই যে হারাম এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান যুগের মাদ্রাসাহ্-মক্তব, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ; রেলগাড়ী-বাস-ট্রাক, সাইকেল-রিক্সা ; উড়োজাহাজ-রকেট ; লঞ্চ-ষ্টিমার এবং রাইফেল-বন্দুক কামান-গোলা প্রভৃতি ; অপর দিকে মাদ্রাসাহ্র পাঠ্যসূচী তথা মাদ্রাসার ইবতেদায়ী জমাআত হইতে নিয়া আলেম-ফাজেল-কামেল প্রভৃতি জমাআত সমূহ ; কিংবা

মাদ্রাসায় পাঠ্য কিতাবাদি এবং নহু-ছরফ্, বালাগাত-হেকমত, এবং কোরআন শরীফে জের জবর-পেশ স্থাপন; আয়াত, রুকুর নম্বর, এবং মঞ্জিল ও জিল্‌দ প্রভৃতির বিভাগ সবই তো বেদআত। আর এইসবের কিছুইতো রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের যুগে ছিল না। তবে কি এই সমস্ত হারাম হইয়াছে? হে ওহাবী মৌলুভী সাহেব! এই সমস্ত বেদআতকে বর্জন করিয়া সম্মুখে এক পা' অগ্রসর হইয়া চলিবার উপায় আছে কি? আমি আমার রচিত 'আনেয়ায়ে মৌলুদ ওয়াল কিয়াম' নামক দলীল দ্বারা প্রমান করিয়া দিয়াছি যে, উক্ত তিন যুগেও কিয়াম ছিল। উক্ত কিতাবটি একবার দেখিয়া লউন। উক্ত তিন যুগে যাহা ছিল না তাহা করা যাইবেনা। এই আইন কি শুধু রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের তাজিমের বেলায়-ই? না দেওবন্দী আলেমদের বেলায়ও? তোমাদের সভায় যখন কোন দেওবন্দী আলেম আসে তখন দল বাঁধিয়া জুলুস করিয়া ষ্টেশনে যাওয়া ঝাণ্ডা হাতে নিয়া চীৎকার করা, শ্লোগান দেওয়া, গলায় ফুলের মালা দেওয়া সভার আসনকে সাজান এবং তাহার ওয়াজের সময় জিন্দাবাদ ধ্বনি করা এবং ষ্টেইজের উপর চেয়ার দেওয়া কিংবা বিছানা ও বালিশ দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আচ্ছা এই ধরণের তাজিম হারাম হইয়াছে না হালাল রহিয়াছে? অতএব, হে ওহাবী মৌলভী সাহেবান:

জানিয়া রাখুন, আপনাদের এই কায়দাই গলদ (মারাত্মক ভুল) বরং তাজিম সূচক রুকু ও সেজদা হারাম ? এতদ্ব্যতীত তাজিম প্রকাশে যে দেশে যে রীতি প্রচলিত আছে উহাই জায়েজ এবং মুসলমানদের দীল যে কাজকে ভাল জানে উহাই এবাদত।

আমাদের বাংলাদেশে যাহাকে মেহ্‌থর বলা হয় পারশ্য দেশে ঐ মেহ্‌থর শব্দের দ্বারা ঐ স্থানের সরদার বা নেতাকে আখ্যায়িত করা হয়। যথা—চিত্রালের নবাব কেবলা হয় মেহ্‌থর চিত্রাল। এক্ষণে, বাংলাদেশে যদি কোন নবীর শানে কেহ ঐ মেহ্‌থর শব্দ প্রয়োগ করে তবে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হইয়া যাইবে ; কিন্তু চিত্রাল বা পারশ্য দেশে নহে। মেরকাত, আশ্‌য়াতুল লুমআতের মোকদ্দমায় ইমাম মালেক রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর হালাত বা অবস্থা প্রসংগে লিখিত আছে যে, ইমাম মালেক (রাঃ) মদীনা মুনাব্বারায় জমীনে কখনো ঘোড়ায় চড়ার সুন নাই ; এবং তিনি হাদীছ বয়ান করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে গোসল করিয়া উত্তম পোশাক পরিধান পূর্ব্বক আতর ব্যবহার করতঃ বড়ই আদব ও ভীতি সহকারে বসিতেন। এক্ষণে, বলুনতো, মদীনা শরীফের এবং হাদীছ শরীফের কথিত তাজিম কোথা হইতে আসিল ? কোন ছাহাবী এই ধরণের তাজিম কখনও প্রদর্শন করিয়াছেন কি ? না, কখনও করেন নাই। কিন্তু হাঁ, হজরত ইমাম মালেক (রাঃ)-র অবশ্যই ইহা দিলের আকর্ষণ যাহা আইনে ছোয়াব (স্বয়ং

ছোয়াব)। তফ্‌ছীরে রুহুল বয়ান শরীফে (মাকানা মোহাম্মাদুন্ আবা আহাদিম্ মির্ রিজালিকুম্) এই আয়াতের মর্ম্মে লিখিত আছে যে, আয়াজের পুত্রের নাম ছিল মোহাম্মদ। সুলতান তাকে এই নামেই ডাকিতেন। একদা সুলতান মাহ্‌মুদ (রাঃ) গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'ওহে আয়াজের পুত্র! পানি লও।' আয়াজ ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন—'হুজুর, গোলাম-জাদার কি অপরাধ হইয়াছে যে, অদ্য তাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন না?' তখন সুলতান মাহমুদ (রাঃ) বলিলেন—'ঐ সময় আমি বিনা ওজুতে ছিলাম। কাজেই, ঐ মুবারক নাম আমি ওজুবিহীন অবস্থায় উচ্চারণ করিতে পারি না। এক্ষণে বলুনতো, এই ধরণের তাজিমের প্রমাণ কোথায় আছে? অথবা ইমাম মালেক এবং সুলতান মাহমুদ (রাঃ) ছাহাবায়ে কেরামগণের চাইতেও বেশী ভালবাসিতেন?

২। প্রশ্ন :—যদি রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের তাজিম করিতে হয় তবে, যখন রাসুলে পাকের নাম উচ্চারিত হয় তখন দাঁড়াইয়া পড়িলেই হয়; কিন্তু মীলাদ শরীফের প্রথম ভাগেই দাঁড়াইয়া পড়া উচিত। কিন্তু ইহা কি রকম কথা যে, প্রথম ভাগে বসিয়া থাকা এবং শেষ ভাগেও থাকা, অথচ মধ্য ভাগে উঠিয়া দাঁড়ানো?

উত্তর :— ইহা তো প্রশ্নই না; যদি আল্লাহ্ পাক কাহাকেও তৌফিক দান করেন তবে যখনই রাসুলে পাকের

নাম মুবারক শ্রবণ করিবে কিংবা উচ্চারণ করিবে তখনই দাঁড়াইতে পারিবে। ইহা কোনও আপত্তির কারণ নাই। আর মীলাদ্ শরীফের মধ্যেও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে পারে, কোনও বাধা নাই। হয় সর্ব্বক্ষণ দাঁড়াইয়া পড়ুক সর্ব্ব অবস্থায় জায়েজ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে ছুন্নত আল্লামা শায়খ আহ্‌মদ রেজা খান বেরিলুভী (রঃ) মাদ্রাসায় হাদীছের ক্লাসে হাদীছের কিতাবসমূহ সর্ব্বক্ষণ দণ্ডায়মান অবস্থায় পড়াইতেন; এবং হাদীছ শিক্ষার্থীগণও তাঁহার অনুকরণে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। আলা হজরত কুদ্দুছ ছিরুহুর এই কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু যখন এই কাজ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকা সম্ভবপর নহে; বরং তক্‌লীফ্ বা কষ্ট উদয় হইবার আশংকা হয় তখন একটা মাহফিলের সুষ্ঠু আদব ও শৃংখলা রক্ষার্থে কেবল হুজুরে পাকের পবিত্র বেলাদত শরীফের তাজকেরা বা জন্ম বৃত্তান্তকালে দাঁড়াইয়া কিয়াম-ই-তাজিমী পালন করা হয়। দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া যে মাহফিল চালু থাকে সে মাহফিলে প্রায় অনেকেই বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে থাকে; এই মুহূর্ত্তে (পবিত্র বেলাদতের তাজকেরা প্রসংগে) দাঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া সমস্বরে ছালাতু ছালাম পাঠ করিলে অনায়াসে তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া যায়, এবং এশ্‌কে মাহবুবে খোদায় অন্তর ধারা শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় এবং দিলের

আকর্ষণ বিপুলভাবে বাড়িয়া যায়। বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ এবং নিদ্রাভঙ্গের উদ্দেশ্যেই মাহফিলে মীলাদের মাঝে মাঝে গোলাপ জল ছিটানো হয়।

মীলাদ শরীফের প্রথম ভাগে বসিয়া থাকা, মধ্য ভাগে দণ্ডায়মান হওয়া এবং শেষ ভাগে বসিয়া থাকার ব্যাপারে যদি কোন প্রকার আপত্তি উঠিতে পারে তবে হে ওহাবী মোল্লা সাহেব! বলিতে পার কি যে, নামাজের মধ্যে কেন কতক সময় দাঁড়াইয়া, কতক সময় রুকুর অবস্থায় এবং কতক সময় সেজদায় যাইতে, আবার কতক সময় বসিয়া বসিয়া নামাজের করণীয় কর্তব্যসমূহ আদায় করিতে হয়? সম্পূর্ণ নামাজ কেন দাঁড়াইয়া পড়া হয় না? আত্তাহিয়্যাতের মধ্যে আশ্‌হাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়ার সময় কেনই বা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিতে হয়? অথচ নামাজের বাহিরে এই কলেমা শরীফ হাজার হাজার বার পাঠ করিলেও শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা অনুরূপভাবে ইশারা করিতে হয় না। এতদ্‌ব্যতীত, ছুফিয়ানে কেরামের কতিপয় ওজিফার মধ্যে ওয়েদ লাগাইয়াছেন; যেমন—কোন মোকদ্দমায় হাকিমের সামনে গেলে কাফ, হা, ইয়া, আইন্‌, ছোয়াদ্‌ এইরূপভাবে পড়িতে হয় যে, প্রত্যেকটি হরফ পড়িবার সময় এক একটি আঙ্গুল বন্ধ করিতে হয়! আবার হা, মিম্‌, আইন, ছিন্‌, কাফ, এইরূপভাবে পড়িতে হয় যে, প্রত্যেকটি হরফ পড়িবার কালে এক একটি আঙ্গুল খুলিতে হয়; কিন্তু যখন কোরআন শরীফ

পাঠ করা হয়, তখন অনুরূপভাবে আংগুল বন্ধ করা এবং খোলা হয় না কেন? বলিতে পার যে, এই সমস্ত বিষয় ছাহাবায়ে কেরামের দ্বারা প্রমাণিত আছে কিনা? তবে কি এই সমস্ত হারাম হইবে? (নাউজুবিল্লাহ্!) ইমাম বোখারী (রাঃ) কতিপয় হাদীছ 'এসনাদান' বয়ান করিয়াছেন, এবং কতক হাদীছ 'তালিকান্' বয়ান করিয়াছেন। বলিতে পার, তিনি সমস্ত হাদীছ এক রকম করেন নাই কেন? ওহাবী নিম-মোল্লাদের মধ্যে কেহ এমন আছে কি, যে ব্যক্তি এইগুলি হারাম বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারে?

৩। **প্রশ্ন**:—মানুষ মীলাদের কিয়ামকে অবশ্য করণীয় বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছে; এবং যারা কিয়াম করে না তাহাদিগকে ঘৃণা ও তিরস্কার করিয়া থাকে। যাহা অবশ্যই করণীয় নহে, তাহাকে করণীয় কর্তব্য বা ওয়াজিব মনে করা জায়েজ নহে। কাজেই মীলাদের কিয়াম নাজায়েজ।

উত্তর:—উহা মুসলমানদের উপর শুধু একটা অপবাদ মাত্র যে, কিয়ামকে ওয়াজিব মনে করা হয়। মীলাদ শরীফের কিয়াম-ই-তাজিমীকে কেহ ওয়াজিব ধারণাও করে না কিংবা কেহ তাহা লিখিয়াও প্রচার করে না। সকলে এক বাক্যে এই কথাই স্বীকার করে যে, কিয়াম মোস্তাহাব এবং ছোয়াবের কাজ। তবে কেন মিছামিছি এহেন অপবাদ ও দুর্নাম রটনা করা? ওহাবীদের উহাই স্বভাব। হাঁ, যদি-ইবা কেহ ওয়াজিব বলিয়া থাকে তবে তাহার ওয়াজিব বলা গলত,

হইতে পারে, ভুল হইতে পারে; কিন্তু, তাই বলিয়া কিয়াম নাজায়েজ কিংবা হারাম হইবে কেন? নামাজের মধ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করা ইমাম শাফেঈ (রাঃ)-এর মতে ওয়াজিব কিন্তু, ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ)-এর তাহা নয়. তাহার মতে 'ছুন্নতে মোয়াক্কেদাহ্'। এক্ষণে, হানাফী মজহাব অবলম্বনকারীগণের নিকট ইমাম শাফেঈ (রাঃ)-এর কথা বিশুদ্ধ নহে। তাই বলিয়া দরূদ শরীফ এবং নামাজ তো আর নিষিদ্ধ নহে। এই বিষয়টি হাজী এমদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী (রাঃ) তাঁহার 'ফাহ্ছালায়ে হাফ্তে মাছ্আলার' মধ্যে খুব সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মোট কথা, এই যে. মুসলমান সদা-সর্বদাই মীলাদের কিয়াম পালন করিয়া থাকে। আর যারা কিয়াম-বিদ্বেষী তাহাদিগকে ওহাবী-দেওবন্দী বলিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ই সঠিক সিদ্ধান্ত।

হাদীছ—মেশকাত শরীফের বাবুল্ কছ্দ্ ফীল্ আমালের মধ্যে আছে—

(আহাব্বুল আমালে ইলাল্লাহে আদ্ওয়ামুহা ওয়া ইন্ ক্বাল্লা!)

অর্থ: 'আল্লাহ্ পাকের নিকট ঐ আমল উৎকৃষ্ট যাহা সর্বদায় করা যায়, যদিও তাহা অল্পও হয়।' ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, প্রত্যেক ভাল কাজকে পাবন্দীর সহিত অর্থাৎ, নিয়মানুবর্ত্তিতা সহকারে পালন করা মোস্তাহাব। এইহেতু, মুসলমান প্রত্যেক ঈদের দিন উত্তম পোশাক পরিধান

করে ; প্রত্যেক শুক্রবারে গোসল করে, আতর বা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক বৎসর রমযান মাসে মাদ্রাসাহ্ বন্ধ রাখে, প্রতি বৎসর বৎসরের শেষে পত্রিকা (বার্ষিক) গ্রহণ করে, মুসলমান রাত্রিকালে শয়ন করে, প্রত্যহ দুপুরে খানাহার করে ; তবে কি এইগুলিকে ওয়াজিব ধারণা করা হয় ? কোন কাজকে সর্বদা নিয়মিত পালন করা কি ওয়াজিবের আলামত ? এক্ষণে বাকী রহিল ঐ বিষয়টি যে, কিয়াম যারা না করে তারা ওহাবী বলিয়া আখ্যায়িত হয় কেন ? তাহা এই কারণে যে, ওহাবী ফেরকা উদ্ভাবনের পর হইতে প্রত্যেক যুগে হিন্দুস্থানে কিংবা পাক-ভারত-বাংলাদেশে তথা সমগ্র বিশ্বে ইহা ওহাবীদের আলামত (চিহ্ন) হইয়া গিয়াছে। যেরূপ, প্রত্যেক যুগেই ঈমানদারের বিভিন্ন আলামত রহিয়াছে ; এবং প্রত্যেক যুগেই কাফেরের আলামত হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত এবং ঈমানদারেরও ভিন্ন (স্বতন্ত্র) আলামত হওয়া উচিত। ইসলামের প্রারম্ভে এই ঘোষণা ছিল যে, যে কেহ শুধু কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিবে সে-ই বেহেশ্‌তী হইবে (মেশকাত কিতাবুল ঈমান দ্রষ্টব্য)। কেননা, ঐ সময় কলেমা পড়াই ঈমানদারের আলামত ছিল। আবার যখন কলেমা পাঠকারীদের মধ্য হইতে মুনাফেক বাহির হইয়া গেল তখন আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করিলেন যে, 'হে নবী ! ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম, আপনার সামনে কতক মুনাফেকও আসিয়া বলে—'আমরা

সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর রাসুল।' আল্লাহ্ পাকও জানেন যে তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল; কিন্তু তথাপি, আল্লাহ্ পাক সাক্ষ্য দিলেন যে, মুনাফেক মিথ্যাবাদী। এক্ষণে বলুনতো মুনাফেক সাক্ষ্য তো ঠিকই দিয়াছিল; কিন্তু তথাপি এরা মিথ্যাবাদী। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে— অচিরেই এমন একটি দল বাহির হইবে যাহারা খুব বেশী এবাদত করিবে; কিন্তু ধর্ম হইতে এমনভাবে বাহির হইয়া যাইবে যেইরূপ তীর শিকার ভেদ করিয়া চলিয়া যায়।

অন্য এক হাদীছে আসিয়াছে—'খারেজী দলের পরিচয় হইবে মাথা মুণ্ডান।' —(মেশকাত শরীফ দ্রষ্টব্য)

লক্ষ্যণীয় যে, উপরিউক্ত তিনটি আলামত জিন যুগে পাওয়া গেল।

'শরহে ফেক্‌হে আকবরের' মধ্যে হজরত মোল্লা আলী কারী (রাঃ) লিখিয়াছেন যে, কেহ ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-র নিকট জিজ্ঞাসা করিল যে, সুন্নী মুসলমানের পরিচয় অর্থাৎ সুন্নাতুল্ জমায়াতের পরিচয় কি? ইমাম আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন—'হুব্বুল্ খোতানাইনে তাফ্‌জীলুস্ শায়খাইনে ওয়া মাছ্‌হু আলাল্ খোফ্‌ফাইনে।'

অর্থ:—'হুজুরে পাকের দুই দামাদ অর্থাৎ ছাইয়্যেদেনা আলী এবং ওছমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে মুহব্বত করা; এবং হজরত ছিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে সমস্ত ছাহাবাগণের উপর আফ্‌জল শ্রেষ্ঠতম জানা; আর চামড়ার মুজার উপর মছহা করা।'

দুররে মোখ্‌তার বাবুল মিয়ার মধ্যে আছে—হাউজের পানি দিয়া ওজু করা উত্তম মোতাজেলা দিগকে রাগাইবার জন্যে। ঐ জায়গায় শামী কিতাবে আছে যে, মোতাজেলা ফেরকা হাউজের পানি দিয়া ওজু করা নাজায়েজ জানে, কাজেই, আমরা হাউজের পানি দিয়া ওজু করিব মোতাজেলা ফেরকাকে জ্বালাইবার বা রাগাইবার জন্য। দেখুন, হাউজের পানি দ্বারা ওজু করা কিংবা চামড়ার মুজার উপর মুছা করা ইত্যাদি ওয়াজেব নহে ; কিন্তু যখন ঐ যুগে উহাদের বিরোধী বাহির হইল তখন উহা পালন করা সুন্নীদের পরিচয়ের আলামতরূপে গণ্য হইল।

তদ্রূপ, মীলাদ-কিয়াম, ফাতেহা ইত্যাদি যদিও ওয়াজিব নহে, তবু যখন মীলাদ-কিয়াম-ফাতেহা এবং আযান বাদ হাত উঠাইয়া মুনাজাত করা, জানাজা নামাজের পর মুনাজাত করার মুনকীর্ বা বিরোধী বাহির হইয়াছে ; কাজেই, বর্ত্তমান যুগে বেশী বেশী মীলাদ পড়া, কিয়াম-ই-তাজিমী পালন করা, আযান বাদ মুনাজাত করা এবং জানাজার নামাজ বাদ মুনাজাত করা সুন্নীদের আলামত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আর যাহারা এই সমস্ত মহা ফজিলতের আমাল ও অনুষ্ঠানাদি পালন করে না তাহারাই ছুন্নাতুল জমাতের নজদিক কুখ্যাত ওয়াহাবী, নজদী, খারেজী, দেওবন্দী, লা-মজহাবী প্রভৃতি বাতেল ফেরকার লোক ; তাদের গোমরাহী মতবাদেরই আলামত হইল মীলাদ-কিয়াম ইত্যাদি না করা। মনে

রাখিবেন, কোন কোন স্থানে মীলাদ মাহফিলে সকলে দাঁড়াইয়া কিয়াম করিলেও ২/১ জন বেয়াদবের মত বসিয়া থাকে। দাঁড়াইয়া ছালাতু ছালাম পাঠ করে না। ইহা দেওবন্দী ওহাবীদের আলামত (লক্ষণ)। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে হাদীছ শরীফে ইরশাদ হইয়াছে—'মান্ তাশাব্বাহা বিকাওমিন্ ফাহুয়া মিনহুম্।' অর্থাৎ, যে যেই দলের অনুসরণ ও অনুকরণ করে সে সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ইহাদের (লা-কেয়ামী ওহাবী বাতেলপন্থীদের) সংশ্রব হইতে বাঁচিয়া থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য নিজের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজত করিবার জন্য।

শামী কিতাবে ইহাও উল্লেখিত আছে যে, কোন জায়েজ অথবা মোস্তাহাব কাজ পালনে যখন অনর্থক বাধা প্রদান করা হয় তখন উহাকে পালন করা অবশ্য করণীয় হইয়া যায়। যেমন, হিন্দুস্থানে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে গরু কোরবাণী দিতে বাধা দেয়; যদিও কেবল গরু কোরবাণী দেওয়াই ওয়াজিব নহে, তথাপি হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা রক্তের বিনিময়ে তাহা জারী রাখিয়াছে। অনুরূপভাবে, মীলাদ শরীফ ও কিয়াম-ই-তাজিমী পালনকে আমাদের প্রাণের আকা মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার শানে রাসুল এবং অমূল্য সম্পদ ঈমানকে জিন্দা রাখার জন্যে রক্তের বিনিময়ে হইলেও জারী রাখিতে হইবে।

বিশেষ ঘোষণা ঃ— অনেক সময় দেওবন্দী ওহাবীরা বলিয়া থাকে—'সুন্নীরা মীলাদ-কিয়াম, ওরছ ও ফাতেহা

প্রভৃতিকে সুন্নীরা আলামত বলিয়া ব্যাখ্যা করে ; কিন্তু কোরআন-হাদীসে এই আলামত কোথায় ? তখন উপরিউক্ত জবাব দিবেন ; তবেই ওহাবীরা লা-জওয়াব হইয়া যাইবে ইন্‌শা আল্লাহ্‌ !

৪। প্রশ্ন ঃ— কাহারও সম্মানের জন্য দাঁড়ান নিষেধ। মেশকাত বাবুল কিয়ামের মধ্যে আছে—ওয়া কানু ইজা রাআ-ওয়ালাম্‌ ইয়াকুমু লেমা ইয়ালামুনা মিন্‌ কেরাহাতিহি লেজালিকা। অর্থ :—ছাহাবায়ে কেরাম যখন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেখিতেন তখন তাহারা দাঁড়াইতেন না ; কেননা, তাহারা জানিতেন যে, হুজুর উহা না-পছন্দ করেন। মেশকাত শরীফের ঐ অধ্যায়ে আরও আছে যে, 'মান ছারারাহু আঁইয়্যাতামাচ্ছালা লাহুর্‌ রিজালুকিয়ামান্‌ ফাল্‌ ইয়াতাবাওয়াআ মাক্‌আদাহু মিনান্নারে।' অর্থ :— 'যে ব্যক্তি চায় (ইচ্ছা করে) যে, লোকজন তাহার সামনে দাঁড়াইয়া থাকুক ; সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে তালাস করে ' হাদীছ শরীফে আরও আছে—'লাতাকুমু-কামা তাকুমুল্‌ আজেমু।' অর্থ :—তোমরা আজমী মানুষের মত দাঁড়াইও না। এই হাদীছ সমূহের দ্বারা জানা গেল যে, জীবনে কাহারও তাজিমের জন্য দাঁড়ান যাইবে না। আর মীলাদে তো রাসুলে খোদা আসেনও না। তাহা হইলে তাজিমী কিয়াম কেমন করিয়া জায়েজ হইতে পারে ?

উত্তর ঃ—ওহাবীরা যতই বলুক না কেন, উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা মীলাদের কিয়ামকে কখনো নিষেধ করা হয় নাই বা হয়ও না। বরং হাদীছ শরীফে ঐ ধরণের কিয়ামকে নিষেধ করা হইয়াছে নিজের সম্মানের জন্য উদ্দেশ্যমূলক কিয়াম ; এবং এই উদ্দেশ্যে যে, আমি বসিয়া থাকি আর মানুষ আমার সামনে দাঁড়াইয়া থাকুক।' এই ধরণের ইচ্ছাপোষণকারীর কিয়ামকে নিষেধ করা হইয়াছে। তাই বলিয়া ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সামনে কিয়াম করা যাইবে না ? যে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান এবং খাঁটী ঈমানদার সে ব্যক্তি কখনো এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবে না। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই ; ছাহাবায়ে কেরাম হুজুর ছাইয়্যেদে আম্বিয়া মাহবুবে কিবরীয়া আলাই-হিচ্ছালামের দরবারে কিয়াম-ই-তাজিমী পালন করিয়াছেন, অর্থাৎ দাঁড়াইয়া তাজিম প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ, আমার রচিত আদিল্লায়ে মৌলুদ ওয়াল্ কিয়াম দ্রষ্টব্য। আল্লামা কাজী আয়াজ (রাঃ) বলিয়াছেন—কিয়াম ঐ ব্যক্তির জন্য নিষেধ, যে ব্যক্তি নিজে বসিয়া থাকে এবং অন্য লোকদের দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করে। এইহেতু, দুনিয়াদারের তাজিমের জন্যে কিয়াম-ই-তাজিমী নিষেধ।

মেশকাত শরীফে আছে—'কুমু ইলা ছাইয়্যেদেকুম্।' অর্থ :—হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন—তোমরা তোমাদের ছরদার বা নেতা ছাআদ ইবনে

মাআজ (রাঃ)র সম্মানার্থে দাঁড়াও। এই স্থানে তো কিয়াম-ই-তাজিমীর প্রত্যক্ষ আদেশ জারী হইয়া গেল। এই স্থানে ওহাবীরা বলে যে, ছালাদ ইবনে মাআজের পায়ে ব্যথা ছিল; তাই রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আনছারদিগকে তাহাকে গাধার উপর হইতে নামাইবার জন্যে। এই স্থানে 'ইলা' শব্দটি সাহায্যের জন্যে আসিয়াছে। ওহাবীদের এই ধরণের ব্যাখ্যা মনগড়া এবং সম্পূর্ণ গলত্ বা ভ্রমাত্মক। প্রকৃত পক্ষে ছাআদ ইব্নে মাআজ (রাঃ)-র পায়ে কোন অসুখ ছিল না এবং 'ইলা' শব্দটিও সাহায্য বোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ, উক্ত হাদীছটির প্রথম শব্দটি কোমু—অথচ উহা জমার ছিগা বা বহুবচনের রূপ। কাজেই, ইহার দ্বারা শত শত আনছারকে হুজুরে আদেশ করিলেন। যদি ছাআদ ইবনে মাআজকে সম্মান প্রদর্শনহেতু এই এই কিয়াম না হইয়া যদি তাহার অসুস্থতা বশতঃ এই কিয়াম হইয়া থাকে তবে, ২/১ জন লোক হইলেই হইত। কারণ গাধার পৃষ্ঠ হইতে নামাইবার জন্যে ২/১ জনই যথেষ্ট। আর শত শত লোকে যদি নামাইতে যায়, তবে দুঃখ আরও বাড়িয়া যাইবার কারণ ঘটিবে। দেখুন, মেশকাত শরীফের হাশিয়ায় আছে যে, ইলা শব্দটি তাজিমের জন্য আসিয়াছে। যথা—'ক্বিলা ইলা লিত্তাজিমে।' পক্ষান্তরে, ইলা শব্দটি যদি সাহায্যের জন্যে হয়, তবে এই স্থানে অর্থ কি হইবে যে, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেন—'ইজা কুমতুম্ ইলাচ্ছালাতে

ফাগ্‌ছিলু উজুহাকুম্'—'যখন তোমরা নামাজের জন্যে দাঁড়াও তখন ওজু করিয়া লও।' এই স্থানেওতো ইলা শব্দটি আসিয়াছে। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, নামাজেরও পা' ভাঙ্গা যে, ইলায় নামাজকে সাহায্য করিয়া নামাইতে আসিয়াছে? ফল কথা, কিয়াম-ই-তাজিমীর কোথাও নিষেধ নাই; যদি নিষেধই হইত তবে দেওবন্দী ভক্তরা দাঁড়ায় কেন? তখন কি হারাম ও শের্‌ক্ হয় না? হাঁা, ইহা কেবল দেওবন্দীদের ধর্মগুরু ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর নীতি পালন করা। এবং আল্লাহ্‌র ছারোয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দুষমণী কর ব্যতীত আর কিছুই নহে। আল্লাহ্‌ হেদায়ত নছীব করুন। 'নুনুল আনোয়ার' নামক কিতাবে আছে—'তাআমুলুন্নাছে মুলহেকুন্ বিল্‌ এজ্‌মায়ে'—অর্থাৎ, মানুষের আমল বা কার্য্য এজমার অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তের চারিটি দলীল। যথা—(১) কোর্‌আন, (২) হাদীছ, (৩) এজমা ও (৪) কিয়াস। এই চারিটি দলীল অত্যাবশ্যকীয়রূপে মানিতে হইবে। কাজেই, প্রায় সহস্রাধিক বৎসর যাবত যে-ই প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম সর্ব্ববাদী সম্মত আমলে পরিণত হইয়া আসিতেছে, এক্ষণে উহা এজমা অনুযায়ী ওয়াজিব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তফছীরে 'খাজায়েনুল্‌ এরফানে' আছে যে, মীলাদের কিয়াম মোস্তাহাব। কিন্তু 'ওছিলাতুল্‌ উজ্‌মা' নামক কিতাবে আছে যে, মীলাদের কিয়াম করা ওয়াজিব। আল্লাহ্‌ পাক জাল্লা শানুহু যেন মুসলমান ভ্রাতৃগণকে রাসুলে

মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পূর্ণ পরিচয় ও মুহব্বত দান করেন। আমীন!

এই মর্মে মুনাজাত করিতেছি:—

মুনাজাত :---

ওগো আমার আল্লাহ দরখাস্ত তোমার পাক দরবারে
রাখিও সদায় মোরে ঈমান ও আমানের সাথে।
মরণ যখন আনিবে নবীজীর কলেমা যেন মুখে জারী থাকে।
দুই নয়নে যেন নবীজীর চেহারায়ে আনোয়ার ভাসে
নবীজীকে না দেখাইয়া নিওনা কবর দেশে॥
নবীজীকে তখন পাই যেন দেখিতে নয়ন ভরে
গোছল-কাফন-দাফন-জানাজাতে রাখিও নবীজীরে
নিদান কবরে মুনকার-নাকীরের প্রশ্নকালে
পাই যেন কাছে তব হাবীব দো-জাহানে।
হাশর-পুল-ছেরাত আর কঠিন মিযানে
রাখিও গো আল্লাহ, নবীজীকে সামনে।
ওগো খোদা! ফরিয়াদ তোমার পাক দরবারে
মদীনা না দেখাইয়া নিওনা কবরে
মাতা-পিতা-দাদা-দাদী-নানা-নানী যাহারা কবরে
মাফ কর মাফ কর গো খোদা তব হাবীবের খাতিরে।
বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়, মুরীদ ও মুতাকেদ যত আছে দুনিয়াতে
রাখিও ইহ-পরকালে সকলে সুখে ও শান্তিতে।

নবীজীর প্রেম ভালবাসা দাও সকলের অন্তরে
যতদিন রাখ দুনিয়াতে, সদা যেন নূরনবী থাকেন
সবার অন্তরে।

• • • •

নবীজীর পাগল বলে যেন দুনিয়ায় জারী থাকে
দোহাই খোদা তোমার পাকজাতেরে
দাও তোমার প্রেম মোদের অন্তরে।
মানবকুলে জন্ম দিলে তোমাকে ভালবাসিতে
কখন যেন না ভুলি থাকি যতদিন দুনিয়াতে।
কবুল কর এ মিনতি নবী দোজাহানের খাতিরে
রেজভীয়া এতিমখানা ও জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া
মাদ্রাসা কবুল কর কৃপা করে।
সুন্নী জামাতের আকায়েদ ও আদর্শ যেন সদা জারী থাকে
গায়েবী এমদাদ করগো আল্লাহ্, এতিমখানা মাদ্রাসাতে
রেজভীর এ মিনতি কাতর স্বরে, এতিমখানায়
সাহায্য যেজন করে
রাখিও তাদেরে আল্লাহ্, উভয়কালে সুখে ও শান্তিতে ॥
কবুল কর ওগো আল্লাহ্, দরুদ ও ছালামের বরকতে ॥

মাওলানা রেজভী সাহেবের প্রণীত কিতাবাদির তালিকা ঃ---

১। নূরে খোদা রহমতে আলম (দঃ)
বা ইমান ভাণ্ডার ১ম খণ্ড মূল্য—২'৫০

২। অতি মহামূল্যবান রত্ন হুব্বে রাসুল
বা ইমান ভাণ্ডার ২য় খণ্ড মূল্য—৩'০০

৩। শানে মাহবুবে খোদা (দঃ)
বা ইমান ভাণ্ডার ৩য় খণ্ড মূল্য—২'০০

৪। মাহবুবে খোদা স্বশীরে জিন্দা
বা ইমান ভাণ্ডার ৪র্থ খণ্ড মূল্য—১'৫০

৫। আশেকে রাসুল মাশুকে এলাহী
বা ইমান ভাণ্ডার ৫ম খণ্ড মূল্য—১'৫০

৬। রাসুলে আকবার এলমে গায়েব তাঁহার উপহার
বা ইমান ভাণ্ডার ৬ষ্ঠ খণ্ড মূল্য—৩'৫০

৭। আল্লাহর হাবিব বিশ্বের সর্বত্র হাজির ও নাজির
বা ইমান ভাণ্ডার ৭ম খণ্ড মূল্য ৫'৫০

৮। তফছিরে ছুরায়ে কাওছার

বা ইমান ভাণ্ডার ৮ম খণ্ড মূল্য—৫'০০

৯। ফাজায়েলে রাসুল

বা ইমান ভাণ্ডার ৯ম খণ্ড মূল্য—৬'০০

১০। এত্তেবায়ে রাসুল

বা ইমান ভাণ্ডার ১০ম খণ্ড মূল্য—৬'০০

১১। ইক্ ও বাতেলের পরিচয়

বা ইমান ভাণ্ডার ১১শ খণ্ড মূল্য—১'৫০

১২। রহমতে মোমিন নবীয়ে করিম

বা ইমান ভাণ্ডার ১২শ খণ্ড মূল্য—১'৫০

১৩। ছিরাতে মস্তাকিম

বা ইমান ভাণ্ডার ১৩শ খণ্ড মূল্য—১'০০

১৪। বাশারিয়তে রাসুল

বা ইমান ভাণ্ডার ১৪শ খণ্ড মূল্য—১'৫০

ইমান ভাণ্ডার নামক কিতাব ২০ খণ্ড মাত্র ইহা ভিন্ন আরও বহু বহু আছে মোট কিতাব ৫০ খানা।

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশ থাকে যে, কিতাবাদি ভিঃ পিঃ পার্শ্বেলের সঙ্গে সঙ্গে ৫'০০ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হয় নতুবা অর্ডার সাপ্লাই দেওয়া হয় না।

ম্যানেজার

রেজভীয়া কুতুবখানা,

সাং—সতরশীর,

পোঃ—ঠাকুরাকোণা,

জিলা—ময়মনসিংহ।